সিরাজ সিকদার রচনা

দেশপ্রেমিকের বেশে ছয় পাহাড়ের দালাল

সিরাজ সিকদার

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি কর্তৃক রচনা ও প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭১

কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বহারা পথ (www.sarbaharapath.com) এর অনলাইন প্রকাশনা ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

১

পূর্ববাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে উপলব্ধি করছেন যে, পূর্ববাংলার সকল রাজনৈতিক পার্টি, মুক্তি বাহিনী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চাকুরীজীবী, শিশু, নারী, কৃষক, বৃদ্ধ, ধর্মীয়, ভাষাগত, উপজাতীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ পূর্ববাংলার সমগ্র জাতির ঐক্য ব্যতীত পাকিস্তানের উপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্ট খুনীদের পূর্ববাংলা থেকে পরিপূর্ণরূপে উৎখাত করা সম্ভব নয়। এ কারণে তারা আন্তরিকভাবে সকলের ঐক্য কামনা করে।

জনগণের এ আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন স্বরূপ পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন পূর্ববাংলার সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বর্তমানে সর্বহারা পার্টি এ উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন সর্বপ্রথম ১৯৬৮ সালে উল্লেখ করে–পূর্ববাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

কর্মীস্বল্পতা, আর্থিক অসুবিধা এবং নতুন সংগঠন হওয়ার জন্য ব্যাপক জনতাকে সংগঠিত করা ও তাদের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচার করা সম্ভব হয়নি। তবুও গত সাড়ে তিন বৎসর সময়ের মাঝে পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় গোপনভাবে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং পূর্ববাংলার বুকে সর্বপ্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করা হয়। আমাদের গেরিলা ও কর্মীরা পাকিস্তান কাউন্সিল কেন্দ্র, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র, বি.এন.আর এবং ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানে বোমা বর্ষণ করে।

আমাদের সংগঠন সর্বপ্রথম তুলে ধরে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে, জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করার সঠিক সামরিক লাইন। আমাদের সংগঠনের বিপ্লবী কর্মী ও গেরিলারা সর্বপ্রথম ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে জাতীয় শত্রু খতম করে।

গত নির্বাচন, পরবর্তীকালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন এ পথের ভুল ও ব্যর্থতা তুলে ধরে এবং সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার করার জন্য বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানে বোমাবর্ষণ করে এবং কর্মীদের গ্রামে গ্রামে গেরিলাযুদ্ধ সূচনার নির্দেশ দেয়।

পাক সামরিক ফ্যাসিস্টরা পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের বাঘের মত ভয় পায় এবং বহু কর্মীকে গ্রেফতার করে। তারা পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তৎপরতা শ্বেতপত্রে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন পূর্ববাংলার সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নিকট প্রকাশ্য পত্র প্রেরণ করে। একই সময় বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রকাশ্য আহ্বান জানায়।

পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন নিজস্ব উদ্যোগেই ছাত্রলীগের রব গ্রুপ, কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম গ্রুপ, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির দেবেন-বাসার গ্রুপের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়।

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ সকল প্রচেষ্টায় সাড়া না দিলেও স্থানীয় ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর দেশপ্রেমিকদের অনেকেই আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ইতিমধ্যে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত করে ৩রা জুন প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ববাংলার বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি "পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি।"

গত মার্চ থেকে আগস্ট মাসের মাঝে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে পাঁচটিরও বেশী জেলায় গেরিলা যুদ্ধ চলছে; জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

পূর্ববাংলার ইতিহাসে এভাবে সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা গড়ে ওঠে।

সর্বত্রই আমাদের গেরিলা ও কর্মীরা জাতীয় ঐক্যের নীতিতে দৃঢ় থেকেছে, দেশপ্রেমিক জনসাধারণ, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্যদের রক্ষা করেছে, ঐক্যে ইচ্ছুকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

পাক-সামরিক ফ্যাসিষ্টদের ২৫শে মার্চ পরবর্তীকালীন আক্রমণের ফলে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। তখন আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর বহু নেতা কর্মীকে সর্বহারা পার্টির কর্মী ও গেরিলারা আশ্রয় দেয়। তাদের ও তাদের পরিবারকে অর্থ, বাসস্থান, খাদ্য, নিরাপত্তা ও কাজের সুযোগ প্রদান করে।

পরবর্তীকালে ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনী পূর্ববাংলায় ফিরে এলে সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আওয়ামী লীগ ও তার মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ করার পরিবর্তে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাদের রক্তে হাত কলঙ্কিত করেছে এবং আমাদের ধ্বংস করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তারা এ জঘন্য অন্তর্ঘাতি কাজ করা জন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক সৈনিক ও কর্মীদের বাধ্য করেছে। কিন্তু তবুও প্রানের মায়া তুচ্ছ করে অনেক কর্মী এদের নীতির স্বরূপ উপলব্ধি করে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে। এরূপ ঐক্যের ফলে ঢাকায় সর্বপ্রথম জাতীয় শত্রু ব্যারিস্টার মান্নানকে খতম করা হয়।

অতীতে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিল তাও তারা ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয়, অস্ত্র, অর্থ ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয়, নিজেদেরকে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ, পূর্ববাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ—এই ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত করে। পূর্ববাংলাকে তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধক দেয়, তারা ভারতের ও

সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। পূর্ববাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ধবংসের কাজকে প্রাধান্য দেয়, পক্ষান্তরে পূর্ববাংলার জাতীয় স্বার্থ বিক্রয়কারী জাতীয় শত্রুদের পয়সার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়; জনগণের ওপর অত্যাচার করে।

২

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার মুক্তিবাহিনী বরিশালের স্বরূপকাঠিতে আমাদের চারজন কর্মী ও গেরিলাকে হত্যা করে, অন্যান্যদের খুঁজে বেড়ায়। মাদারীপুরে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যরত আমাদের সমর্থকদের খতমের ষড়যন্ত্র করলে তারা বেরিয়ে আসে। এই তাবেদার বাহিনী আমাদের কর্মীর বাড়ীতে হানা দেয় এবং নারীদের নির্যাতন করে, বাড়ী লুট করে।

সম্প্রতি টাঙ্গাইলে তারা আলোচনার কথা বলে আমাদের দু' জন কর্মীর সাথে বৈঠকে মিলিত হয় এবং সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের গ্রেফতার করে। তারা গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের বন্দুকের ডগায় সমস্ত গেরিলাদের নিকট থেক অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য পাঠায়। আমাদের গেরিলারা এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। একজন নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু অপরজনকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ এলাকার এক জাতীয় শত্রুর নির্দেশে তারা আমাদের দু' জন গেরিলাকে কেটে লবন দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তারা বরিশাল জেলার ঝালকাঠি, কাউখালি, স্বরূপকাঠি অঞ্চলে আমাদের তিনটি গেরিলা ইউনিটকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করে এবং গেরিলাদের বন্দী করে, আমাদের গেরিলাদের কেউ কেউ পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়, বাকীদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ধারনা করা হচ্ছে তাদেরকে মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিষ্ট খুনীরা হত্যা করেছে।

এ এলাকায় তারা আমাদের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়।

তারা আমাদের নারী গেরিলা শিখাকে বন্দী করে, তার পরিবারের সকলকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করে; শিখার উপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার চালায়, তাকে ধর্ষন করে। তার খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি।

তারা আরো কয়েকজন নারী গেরিলা ও কর্মীকে খতমের জন্য খোঁজ করে।

তাদের এই ঘৃন্য, বর্বর, ফ্যাসিবাদী তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করে ভারতীয় শীখ, গুর্খা সৈন্য ও অফিসাররা।

তারা ফরিদপুরের কালকিনী অঞ্চলে আলোচনার কথা বলে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের দু' জন গেরিলাকে বন্দী ও নিরস্ত্র করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে জনসাধারণ বুক পেতে দেয়, "আমাদের আগে হত্যা কর, তারপর এদেরকে হত্যা কর।" জনগণের হস্তক্ষেপে তারা আমাদের কর্মীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

কুখ্যাত ডাকাত-নারী নির্যাতনকারী কুদ্দুস মোল্লার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্ট দস্যুরা মেহেন্দিগঞ্জেও আমাদের একাধিক গেরিলা ইউনিটকে নিরস্ত্র করে, মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে এবং গেরিলাদের গ্রেপ্তার করে। তাদের ওপর অশেষ নির্যাতন চালায়।

গৌরনদী অঞ্চলে তারা আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয় এবং কর্মীদের খতম করার প্রচেষ্টা চালায়।

মঠবাড়িয়া অঞ্চলে এই ফ্যাসিষ্ট দস্যুরা আমাদের মুক্ত অঞ্চল আক্রমন করে ও দখল করে নেয়। গেরিলাদের সামনা-সামনি ধ্বংস করতে না পেরে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতকতার পথ গ্রহণ করে। একসাথে কাজ করার ভাওতা দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয় এবং যৌথ আক্রমনের সময় পিছন থেকে গুলি করে প্রতিভাবান কর্মী হাসানকে হত্যা করে। এর সাথে শহীদ হয় হিমু নামক অপর এক কর্মী।

বরিশালের পাদ্রিশিবপুর অঞ্চলে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ভান করে তারা সুযোগ সন্ধান করে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের খতম করার জন্য। শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে ডেকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাসুম ও অপর এক গেরিলাকে তারা হত্যা করে।

ঢাকার নরসিংদী অঞ্চলে আমাদের গেরিলাদের তারা অস্ত্র জমা দিতে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলে, অন্যথায় খতম করবে বলে হুমকি দেয়। আমাদের গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের নিকট বেত দেখিয়ে এ ফ্যাসিষ্টরা বলে "তোমাদের নেতা 'সিরাজ সিকদার' কে গ্রেফতার করে বেত দিয়ে মারতে মারতে ভারতে নিয়ে যাব।"

পুর্ববাংলার সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর এই ফ্যাসিস্টরা সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের গোলাম হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ দেশপ্রেমিকদের খতম করার জন্য। পাক-সামরিক দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের খোঁজ করা-খতম করার ওপর তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

৩

পঁচিশে মার্চের পূর্বে ক্ষমতার দম্ভে ভুলে এই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিষ্টরা কমিউনিষ্টদের জ্যান্ত কবরস্ত করা, নকসাল ধ্বংস করার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমেই বামপন্থীদের খতম করবে। কিন্তু তারও ধৈর্য্য তাদের ছিল না, অনেক স্থানেই দেশপ্রেমিকদের তারা খতম শুরু করে। অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তাদের দখলকৃত এলাকার জেলখানায় আমাদের কর্মীদের মুক্তি দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়।।

তারা উগ্রজাতীয়তাবাদী হয়ে হিটলারের ইহুদী নির্মূলের পথ অনুসরণ করে। অপরাধী-নিরপরাধী নির্বিশেষে অবাঙ্গালী উর্দু ভাষাভাষী শিশু, নারী, যুবক, বৃদ্ধ, অর্থাৎ সবাইকে হত্যা করার ফ্যাসিষ্ট তৎপরতা চালায়। শত শত নিরপরাধ নারীদের তারা ধর্ষণ করে, উলঙ্গ করে হাঁটায়, নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালায়, শিশুদের মায়ের সামনে হত্যা করে, মাকে শিশুর রক্ত পানে বাধ্য করে, বৃদ্ধ-যবকদের সারিবেঁধে গুলি করে

হত্যা করে। এ জঘন্য কাজে তারা মেশিনগান, কামান পর্যন্ত ব্যবহার করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা আগুন দিয়ে হত্যা করে।

অনেক ক্ষেত্রে শিশু-নারীদের তারা নদীর মাঝে নির্জন দ্বীপে ফেলে আসে অভুক্ত অবস্থায় তাদের মারার জন্য। নিরীহ নারী-শিশুরা আশ্রয়ের জন্য গ্রামের পর গ্রাম হেঁটে বেড়ায়। এই ফ্যাসিষ্টদের ভয় উপেক্ষা করে কেউ কেউ তাদের আশ্রয় ও খাদ্য দেয়। এসকল আশ্রয়হীন নারী-শিশুদের তারা পথিমধ্যে হত্যা করে, নারীদের ধর্ষণ করে ও অপহরণ করে।

এভাবে বহু দেশপ্রেমিক শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, কর্মচারী প্রাণ হারায়।

এদের অপরাধ এরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। এভাবে এরা পূর্ববাংলার উর্দুভাষাভাষী জনগণের সাথে বাঙ্গালীদের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে।

তাদের এসকল কার্যকলাপের সাথে পাক-সামরিক ফ্যাসিষ্টদের কার্যকলাপের কোন পার্থক্য নেই।

৪

পাক সামরিক দস্যুদের শীতকালীন অভিযান শুরু হওয়ার পূর্বেই আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টরা আমাদেরকে উৎখাত করতে চায়। শীতকালীন অভিযানে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, টিকতে পারবেনা, বাধ্য হয়ে তাদের ভারতে পালাতে হবে। পরবর্তী বর্ষাকাল আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাদের ভয় হলো আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ধ্বংস করতে না পারলে আমরা তাদের পরিত্যাক্ত এলাকায় গেরিলা যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবো। ফলে তাদের ফিরে আসা অসুবিধাজনক হয়ে উঠবে।

পূর্ববাংলার জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পথে তারা আমাদেরকে প্রধান বাধা বলে মনে করে। বর্তমানে তারা অস্ত্র, অর্থ, আশ্রয় ও সমর্থনের বিনিময়ে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট পূর্ববাংলাকে বন্ধক দিয়েছে। যুদ্ধ করে পূর্ববাংলাকে দখল করতে ব্যর্থ হলে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাবেদার আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টরা পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোষ করবে, পূর্ববাংলাকে একসাথে ভাগ করে লুট করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে।

পূর্ববাংলাকে যত্রযত্র বিক্রির ষড়যন্ত্রকে আমরাই জনগণের সামনে তুলে ধরি, জনগণ তাদের চরিত্র বুঝে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কবরস্ত করবে।

৫

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টদের নেতৃত্বে পূর্ববাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা ভারতের কলোনীতে রূপান্তরিত হবে। এতে পূর্ববাংলার কোন উপকার হবে কি?

ভারতের শাসকগোষ্ঠী হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদের প্রতিনিধি। পুর্ববাংলায় নেমে আসবে এই চার পাহাড়ের শোষণ, এর সাথে যুক্ত হবে চার পাহাড়ের শোষন ও লুন্ঠনের উচ্ছিস্ট ভোগের জন্য পূর্ববাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ অর্থাৎ দুই পাহাড়। পূর্ববাংলা আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টদের দ্বারা মুক্ত হলে এভাবে ছয় পাহাড়ের শোষণ জনগণের ওপর চেপে বসবে।

চার পাহাড়ের শোষণ ও লুন্ঠনের ফলে ভারত আজ দুর্ভিক্ষ, অভাবের দেশে পরিণত হয়েছে। সেখানে পাঁচ টাকা সের চাল, আট টাকা একটা ইলিশ মাছ, একটা ডিম এক টাকা। জনগণ সারাদিন দেড় ছটাক চালও খেতে পায়না। অনাহার, বেকারী, অসুস্থতার ফলে জনগণ উপলব্ধি করছে, বৃটিশের হাত থেকে 'স্বাধীনতা' অর্জনের মাধ্যমে লাভবান হয়েছে বিড়লা, টাটা, ভারতের জমিদার-জোতদার এং সাম্রাজ্যবাদীরা। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন জাতি, উপজাতিকে শোষণ করছে। তারা গণতন্ত্রের নামে কায়েম করেছে ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব, তারা পাকসামরিক দস্যুদের মত রাজপথে, বাড়ীতে বিনাবিচারে জনগণকে গুলি করে হত্যা করে, বন্দী করে, গ্রাম লুট করে, পুড়িয়ে দেয়, সেখানে জনগণকে হত্যা করে।

শোষণ-নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে ভারতের কৃষক-জনতা আজ বিদ্রোহ করছে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে চার পাহাড়ের ভীত্ কাঁপিয়ে দিয়েছে। এরাই আজ নকশাল নামে জমিদার, পুঁজিপতি আর সাম্রাজ্যবাদীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

ভারত পূর্ববাংলায় তার কলোনী স্থাপন করে তার আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট কিছুটা দূর করার চেষ্টা করছে। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের এই কলোনীতে লুন্ঠন ও শোষণের বখরা নেয়া এবং চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার ঘাঁটি স্থাপনের স্বপ্ন দেখছে।

পূর্ববাংলার সীমান্ত বন্ধ থাকা সত্বেও পূর্ববাংলার মাছ, মাংস, ধান, পাট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কালো বাজার হয়ে ভারতে যায়। এর ওপর রয়েছে পাকসামরিক দস্যুদের লুন্ঠন ও শোষণ। তবুও পূর্ববাংলার জনগণ দেড় টাকা বা তার কম সের চাল, এক টাকা দেড় টাকা দর ইলিশ মাছ, ছোটোখাটো ব্যবসায়-বাণিজ্য, কিছু কিছু চাকুরী পায়।

ভারতের কলোনী হলে পূর্ববাংলার মাছ-মাংস-চাল-সব্জি চলে যাবে কোলকাতা, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, মেঘালয়ে। পূর্ববাংলার জনগণকে তখন খেতে হবে পাঁচ টাকা সের চাল, আট টাকায় একটি ইলিশ মাছ। সাধারণ শিক্ষিত দূরের কথা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের মাঝে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারীদের চাকুরীর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ভারতের প্রায় লাখ খানেক বেকার ইঞ্জিনিয়ার এবং কয়েক লাখ বেকার ডাক্তারদের সাথে। একশ দেড়শ টাকার চাকুরী তাদের জন্য সৌভাগ্য হবে।

পূর্ববাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প চলে যাবে ভারতের বিড়লা, টাটা এবং অন্যান্য দক্ষ পুঁজিওয়ালা মারোয়ারী, সাহা, বসাকদের হাতে।

পূর্ববাংলা থেকে ১৯৪৭ সাল ও তার পরবর্তীকালে বিতাড়িত হিন্দু জমিদার-জোতদাররা পুনরায় ফিরে আসবে গ্রামসমূহে, দখল করবে তাদের পরিত্যাক্ত ভূ-সম্পত্তি, কৃষকদের ওপর শুরু করবে নির্যাতন।

সমগ্র পূর্ববাংলার জনগণের ওপর নেমে আসবে ধর্মীয় নির্যাতন, রায়ট, দাঙ্গা।

পূর্ববাংলার জনগণ পৃথক ভূখণ্ড চেয়েছিল কেন? সুদীর্ঘ কাল থেকেই পূর্ববাংলা ছিল হিন্দু জমিদার আর ব্যবসায়ীদের লুন্ঠনক্ষেত্র। জমিদার-ব্যবসায়ীদের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা, পূর্ববাংলা ছিল কলিকাতার পশ্চাদভূমি। পূর্ববাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভূমি একচেটেভাবে হিন্দুদের হাতে ছিল। হিন্দু জমিদারদের নির্মম মুসলীম বিরোধী নির্যাতনের কাহিনী শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মুসলিম জনগণের ওপর এ নির্মম নির্যাতন ও শোষণের কারণেই তারা পৃথক ভূখণ্ড পূর্ববাংলা দাবী করে।

পূর্ববাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের কলোনীতে পরিণত হলে পূর্ববাংলার জনগণের ভাগ্য হবে তপ্ত খোলা থেকে চুলায় পড়ার সামিল।

৬

ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর দস্যুরা এখনও পূর্ববাংলার ক্ষমতা দখল করেনি, এর মাঝে তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সহ্য করছেনা, ফ্যাসিষ্ট হিটলারের মত পূর্ববাংলায় মুক্তিযুদ্ধ করছে এরূপ অন্যান্য দেশপ্রেমিক পার্টি ও ব্যক্তিদের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য বন্দুক ব্যবহার করছে। পূর্ববাংলা এদের নেতৃত্বে মুক্ত হলে সেখানে এরা কায়েম করবে হিটলারের এক পার্টির একনায়কত্বের শাসন ও লুন্ঠন।

অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করছে এরা যে গণতন্ত্র চায় তাহলো হিটলারের এক পার্টির ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব, এরা যে সমাজতন্ত্র চায় তাহচ্ছে ছয় পাহাড়ের শোষন ও লুন্ঠন এবং এরা যে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা চায় তা হচ্ছে ভারতের ও সাম্রাজ্যবাদের কলোনী হিসেবে পূর্ববাংলাকে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করা।

৭

পূর্ববাংলার জনগণকে এরা ভাওতা দিতে সক্ষম হচ্ছে কারণ, হক-তোয়াহা নয়াসংশোধনবাদী, দেবেন-বাসার, মতিন-আলাউদ্দিন ট্রটস্কি-চেবাদী, কাজী-রন ষড়যন্ত্রকারী এবং মনিসিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকচক্র পূর্ববাংলার জাতীয় প্রশ্নে বামপন্থীদের ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। এদের অনেকে পাক-সামরিক দস্যুদের দালালী করে।

৮

ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্ট দস্যুরা ব্যাপক হারে ভারত থেকে পূর্ববাংলায় অনুপ্রবেশ করছে। তারা আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। তারা দম্ভভরে বলে বেড়াচ্ছে পূর্ববাংলা তারা এবার দখল করবে, একে ভারতের কলোনীতে পরিণত করবে।

এরা পূর্ববাংলায় প্রবেশ করে ভারতের তাবেদার হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের আক্রমণ করছে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, পাট পুড়াচ্ছে, জনগণকে চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে উৎখাত করছে, যত্রতত্র মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, জনগণকে হত্যা করছে, বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করছে। পানাহার, নারী নিয়ে মত্ত রয়েছে। পাকসামরিক দস্যু ও তাদের দালালদের আক্রমণ করা তাদের গৌণ কাজ।

এদের অধিকাংশই ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ভারতে কয়েকদিন ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে থাকে, নৌকায় অবস্থান করে, অনেক সময় সামন্ত-জমিদার-জোতদারদের বাড়ীতে থাকে। কয়েকটি দলের একজন কমাণ্ডার থাকে। এসকল দলের নিজেদের মাঝে ঐক্য বা হৃদ্যতা, শৃংখলা খুবই নিম্নমানের। মাদারীপুর মহকুমার ডামুডিয়ায় পাকসামরিক দস্যুদের আক্রমণের সময় দেখা যায় তাদের মাঝে কোন সমন্বয় নেই। ফলে এরা মার খায়।

এরা মুখে বলে গেরিলা যুদ্ধ করছে, নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দেয়। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে এরা প্রয়োগ করছে সামনা-সামনি অবস্থান যুদ্ধ, ঘেরাও যুদ্ধের কৌশল। ডামুডিয়া এলাকায় তারা বাংকার থেকে পাক সামরিক দস্যুদের আক্রমণ করে। পাক দস্যুদের একদল পিছন দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে খতম করে। ডামুডিয়ার নিকট ভেদরগঞ্জ থানা পনের ঘন্টা ধরে আক্রমণ করে, বহু মর্টার-গোলা বর্ষণ করে তা ধ্বংস করে।

অস্ত্রের ওপর অতি নির্ভরতা, দখলকৃত ভূমি হাতছাড়া হতে না দেয়া, নিজেদের শক্তির ওপর অতিবিশ্বাস, শত্রু শক্তির ওপর অবিশ্বাস, জনগণের ওপর অনির্ভরতা প্রভৃতি নিজেদের ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে না শেখার ফলে উদ্ভূত হয়েছে তাদের উপরোক্ত যুদ্ধনীতি ও কৌশল।

শত্রুকে তাদের গেটের বাইরে ঠেকাবার জন্য তারা তাদের শক্তি একত্রিত করে, পাকদস্যুদের বাধা দেয়, সামনা-সামনি যুদ্ধ করে এবং ধ্বংস হয়।

তারা জাতীয় শত্রুদের খতম করা, জাতীয় শত্রুদের ভূমি কৃষকদের মাঝে বিতরণ, দেশপ্রেমিক সামন্তবাদীদের শোষণ কমানো, দেশপ্রেমিক অন্যান্য শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, জনগনকে সশস্ত্র করা, তাদের সংগঠিত করা, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করা, জনগণের ওপর নির্ভর করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে না; উপরন্তু জনগণকে করে অত্যাচার, দেশপ্রেমিকদের হত্যা। একারণে পূর্ববাংলার কোটি কোটি জনতা তাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, তাদের নিয়মিত বাহিনী একার পক্ষে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

সর্বোপরি তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে প্রগতি বিরোধী যুদ্ধ করছে। একারণে তারা ব্যর্থ হচ্ছে গণযুদ্ধের নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে।

অতীতেও তারা এই যুদ্ধনীতি ও কৌশল প্রয়োগ করেছে। তারা শহর দখল করার দিকে প্রথম নজর দেয়, শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটি ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে, নিজেদের দখলকৃত এলাকা বজায় রাখার জন্য শহর-বন্দরে সামরিক দস্যুদের বাধা দেয়। তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লোকজন এবং দখলকৃত শহর-বন্দর থাকতেও তারা পরাজিত ও উৎখাত হয়।

চট্রগ্রামে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই,পি,আর, পুলিশ, ছাত্র, ভারতীয় সৈন্য সমেত হাজার হাজার যোদ্ধা প্রতিরোধ তৈরী করে, টেলিফোন লাইন বসায়, অস্ত্র, সৈন্য আনার জন্য ভারতের সাথে ট্রাক যোগাযোগ স্থাপন করে, তারা কামান, মর্টার, মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র অর্থাৎ বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যতীত সবকিছু ব্যবহার করে কিন্তু সম্মুখ অবস্থান যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয় এবং ভারতে বিতাড়িত হয়।

মেজর জিয়া দম্ভভরে ঘোষণা করেছিল ঢাকা কয়েকদিনের মাঝে দখল করবে। মেজর জলিল ঘোষণা করেছিল বরিশাল আর পরাধীন হবে না। এদেরসহ আরো অনেক মেজর-কেপ্টেন-লেফটেনান্টের মাথা শেষ পর্যন্ত দেয়ালে ঠেকে, তারা ভারতে বিতাড়িত হয় বা প্রাণ হারায়। এদের ভুলের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়, তাদের ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং তারা ভারতে যেতে বাধ্য হয়।

ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ যদি তাদের আশ্রয় না দিত, পুনরায় সশস্ত্র না করতো তবে তাদের এই বিদ্রোহ জুন-জুলাই মাসেই শেষ হয়ে যেতো।

ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে পুনরায় তাদের পূর্ববাংলায় অনুপ্রবেশ করার প্রক্রিয়ায় তাদের চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন হয়। অতীতে তাদের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিল তাও তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয়, অর্থ, অস্ত্র ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয়, তারা ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত হয় এবং পূর্ববাংলাকে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধক দেয়।

এভাবে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে প্রগতি বিরোধী যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ জাতীয় পরাধীনতার যুদ্ধে পরিণত হয়। পূর্ববাংলাসহ পৃথিবীর কোনো প্রগতিশীল শক্তিই তাদের এ প্রগতিবিরোধী পশ্চাদগামী যুদ্ধ সমর্থন করে না।

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টদের যুদ্ধনীতি ও কৌশল এবং কার্যকলাপ এবং প্রগতিবিরোধী যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানী দস্যুরা তাদের সবল দিকগুলো ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। তারা তাদের সৈন্যদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, উন্নত সৈন্যসংস্থান (কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ান, রেজিমেন্ট ইত্যাদি), শৃংখলা, ধর্মীয় মনোবল, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক অস্ত্র, আন্তর্জাতিক দেশসমূহের সমর্থন বা নিরপেক্ষতা ব্যবহার করছে।

একারণে ২৫শে মার্চের পরবর্তী সময় বিরাট এলাকা ও শক্তি এবং গণসমর্থন থাকা সত্বেও আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টরা পরাজিত হয়।

বর্তমানেও তারা একই কারণে পরাজিত হবে যত অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য তাদের থাকুকনা কেন। তাদের লোকজন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, অনেকে ভারতে পালিয়ে যাবে। তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কিছু অংশ পাক-সামরিক দস্যুদের হাতে যাবে, কিছু অংশ নদী-খাল-পুকুর-মাটির তলে আশ্রয় নেবে, কিছু অংশ আমাদের হাতে আসবে, বাকীটা ভারতে ফেরত যাবে। তাদের ভুলের জন্য পুনরায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রান হারাবে, তাদের ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হবে।

পাকসামরিক দস্যুদের পরাজিত করে পূর্ববাংলা দখল করতে হলে বিরাট সংখ্যায় অর্থাৎ হাজারে হাজারে তাদেরকে একে একে যুদ্ধে খতম করতে হবে; তাদের ঘাঁটি ও শহর দখল করতে হবে। এজন্য উচ্চ পর্যায়ের ঘেরাও যুদ্ধ ও অবস্থান যুদ্ধও করতে হবে। এজন্য যে সৈন্য-সংস্থান, শৃংখলা, যুদ্ধ অভিজ্ঞতা, মনোবল ও যুদ্ধনীতি এবং কৌশল প্রয়োজন তা এ মুক্তিবাহিনীর দস্যুদের নেই।

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ দ্রুত পূর্ববাংলা দখল করার আরেকটি পথ অবলম্বন করতে পারে। অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা পূর্ববাংলা বা গোটা পাকিস্তান আক্রমণ করা এবং তাদের তাবেদার মুক্তিবাহিনী দ্বারা পূর্ববাংলার অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ঘটানো। অর্থাৎ সীমান্ত আক্রমণ করে পাকদস্যুদের সেখানে ব্যপৃত রাখা ও তাদের ধ্বংস করা এবং তাবেদার বাহিনী কর্তৃক পূর্ববাংলা ভেতর থেকে দখলের সুযোগ করে দেয়া।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যাতে সৈন্য আসতে না পারে তার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত আক্রমণ করা, সমুদ্র দিয়ে যাতে পূর্ববাংলায় সামরিক দস্যুরা আসতে না পারে তার জন্য সমুদ্রপথ বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

এতে পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে যাবে। চীনসহ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহ ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট পূর্ববাংলা দখলের এ আগ্রাসী যুদ্ধকে বিরোধীতা করবে। পূর্ববাংলার জনগণেরও একটা বিরাট অংশ এ যুদ্ধকে বিরোধীতা করবে। ভারত নিজেও অধিকতর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটে পড়বে।

ভারতের আগ্রাসী বাহিনী এবং পূর্ববাংলার অভ্যন্তরস্ত তাবেদার মুক্তিবাহিনীর একযোগে আক্রমণের ফলে কয়েকটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

একটি পরিস্থিতি হতে পারে–পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ পরাজয়, পূর্ববাংলা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের কলোনীতে রূপান্তর, মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টদের নেতৃত্বে পূর্ববাংলায় একটি পুতুল সরকার গঠন।

অন্য পরিস্থিতি হতে পারে–পাকিস্তানী ফ্যাসিষ্ট দস্যুরা আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান ও ভারতীয় হামলা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে, তখন আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টদের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনার পথ গ্রহণ করা ব্যতীত আর কোনো পথ থাকবেনা। এর ফলে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হবে, আপোষ-টেবিলে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অংশ স্বীকার করে সমাধানে আসার জন্য ভারত, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তাবেদার মুক্তিবাহিনী প্রচেষ্টা চালাতে পারে। ফলে অনিবার্যভাবেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব সর্বহারা শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির হাতে এসে পড়বে।

পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের কলোনীতে রূপান্তরিত করলে পূর্ববাংলার জনগণ অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে সক্ষম হবে তাদের রক্ত দান বৃথা হয়েছে; ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুন্ঠন উপড়ে ফেলার জন্য তারা প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করবেন। সর্বহারা শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টি ব্যতীত এ সংগ্রামে নেতৃত্বদানের আর কেউ থাকবে না।

যে পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলার সর্বহারা শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির হাতে পূর্ববাংলার বিপ্লবের নেতৃত্ব আসবেই।

ভারত যুদ্ধ বাধিয়ে পূর্ববাংলাকে তার কলোনীতে রূপান্তরিত করবে এ সম্ভাবনা কম, ভারতের পক্ষে সীমান্তে উস্কানী সৃষ্টির সম্ভাবনাই অধিক। এর কারণ ভারতের এই আগ্রাসী যুদ্ধ চীনসহ বিশ্বের প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহ বিরোধিতা করবে। এ যুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র দূর্বল হয়ে পড়বে, এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ দূর্বল হয়ে পড়বে। ভারতের জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠবে। প্রথম মহাযুদ্ধে জন্মলাভ করেছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জন্মলাভ করেছে চীনসহ আরো বহু সমাজতান্ত্রিক দেশ। কাজেই পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান, ভারত, পূর্ববাংলা যে কোন স্থানেই সর্বহারা শ্রেণীর দ্রুত ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখা দেবে। সাম্রাজ্যবাদীরা এজন্য প্রচেষ্টা চালাবে যুদ্ধকে রোধ করতে।

৯

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টদের দ্বারা জাতীয় মুক্তির নামে প্রগতি বিরোধী জাতীয় পরাধীনতার যে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ চলছে তা পূর্ববাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারেনা। যুদ্ধক্ষেত্র বা আপোষ টেবিল কোনটার মাধ্যমেই এরা পুর্ববাংলাকে সকল বৈদেশিক শোষণ মুক্ত এবং দেশের অভ্যন্তরে সামন্তবাদীদের উৎখাত করে কৃষকের মুক্তি আনতে সক্ষম হবে না।

পূর্ববাংলার জনগন অনেকেই এদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারছে না, কিন্তু আজ হোক কাল হোক জনগণ এদের ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে এদের প্রকৃত ছয় পাহাড়ের দালালীর চরিত্র বুঝতে পারবে এবং অনিবার্যভাবেই জনগণ এদেরকে কবরস্থ করবে।

ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার হতে ইচ্ছুক নয়, এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধরত দেশপ্রেমিকদের এবং নিরীহ শিশু, নারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধের রক্তে এরা হাত কলংকিত করেছে, আজ হোক কাল হোক, রক্ত দিয়েই তাদেরকে এ রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে। সমাজ নিজস্ব নিয়মেই এগিয়ে যাচ্ছে। যত প্রচেষ্টাই চালাক না কেন তারা পূর্ববাংলাকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারবেনা, পূর্ববাংলার জনগণ ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টদের জাতীয় পরাধীনতার প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতার বিপ্লবী যুদ্ধ দ্বারা বিরোধিতা করবে, পাকিস্তানের উপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে পূর্ববাংলা থেকে পরিপূর্ণরূপে উৎখাত করবে, সামন্তবাদকে উৎখাত করে কৃষকজনতাকে মুক্ত করবে, এবং স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েম করবে। পূর্ববাংলার জনগণের বিজয় অনিবার্য। ■